অধ্যায় - ১৪

নাদেড়ের রতনজী ওয়াডিয়া, সন্ত মৌলা সাহেব, দক্ষিণা মীমাংসা, গণপত্ রাও বোডস্, শ্রীমতি তর্খড, দক্ষিণা মর্ম।

শ্রী সাইবাবার কথা ও কৃপার দ্বারা কিভাবে অসাধ্য রোগ নির্মূল হয়ে যায়, গত অধ্যায়ে সেটা বর্ণনা করা হয়েছে। এবার বাবা কিভাবে রতনজী ওয়াডিয়াকে অনুগৃহীত করেন এবং তাঁকে পুত্রপ্রাপ্তির আশীর্বাদ দেন - তার বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হবে।

এই সন্তের জীবনী সর্বরূপে প্রাকৃতিক ও মধুর। তাঁর অন্যান্য কার্য্যকলাপ, যেমন-খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা ও সহজ-স্বাভাবিক অমৃতোপদেশ একই রকম মধুর। তিনি ছিলেন আনন্দের অবতার। নিজের ভক্তদেরও এই পরমানন্দের রসাস্বাদন করান। তাই ভক্তরা তাঁকে কখনো ভুলতে পারেনি। বিভিন্ন রকমের কর্ম ও কর্তব্যের উপদেশ তিনি ভক্তদের দেন, তাই তারা সত্যের পথ অবলম্বন করতে সক্ষম হয়। বাবা সর্বদা চাইতেন যে, লোকেরা সুখে জীবন যাপন করুক এবং সদৈব সজাগ থেকে নিজের জীবনের পরম লক্ষ্য, আত্মানুভূতি (ঈশ্বর দর্শন), অবশ্যই প্রাপ্ত করুক। **পূর্ব জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপই এই দেহ প্রাপ্ত হয়েছে এবং এর সার্থকতা তখনই সিদ্ধ হবে, যখন এর সাহায্যে আমরা এই জীবনে ভক্তি ও মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারব।** জীবনের শেষ সময় ও জীবন লক্ষ্যর বিষয়ে সর্বদা সাবধান ও সতর্ক থাকা উচিত। যদি তুমি নিত্য শ্রী সাই লীলা শ্রবণ করো, তাহলে সর্বদা তাঁর দর্শন পাবে। দিনরাত হৃদয় দিয়ে তাঁকেই স্মরণ করো। এইরূপ আচরণ করলে মনের চঞ্চলতা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। এর নিরন্তর অভ্যাসের ফলে চৈতন্যধন থেকে অভিন্নতা লাভ হবে।

নাঁদেড়ের রতনজী ওয়াডিয়া ঃ-

এবার আমরা এই অধ্যায়ের মূল ঘটনার বর্ণনা শুনব। নাঁদেড়ে (নিজাম রাজ্য) রতনজী-শাপুরজী ওয়াডিয়া নামক এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী থাকতেন। ব্যবসা করে উনি অনেক ধন সংগ্রহ করেছিলেন ও বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে ওঁকে খুব সুখী ও সন্তুষ্ট মনে হত. কিন্তু আসলে উনি অন্তরে দুঃখী ছিলেন। বিধাতার নিয়ম এমনই বিচিত্র যে. এই সংসারে পূর্ণ রূপে সুখী কেউই নয়। উনি পরোপকারী

ও দানী ব্যক্তি ছিলেন এবং গরীব-দুঃখীদের অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করতেন। সবাইকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতেন। ওঁকে লোকেরা অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করত। কিন্তু দীর্ঘকাল অবধি কোন সন্তান না হওয়ার দরুণ উনি খুবই সন্তপ্ত ছিলেন। যেরূপ প্রেম ও ভক্তিরহিত কীর্তন, বাদ্যযন্ত্ররহিত সঙ্গীত, যজ্ঞোপবীতরহিত ব্রাহ্মণ, ব্যবহারিক জ্ঞানরহিত শিল্পী, পশ্চাতাপরহিত তীর্থযাত্রা ও কণ্ঠমালা ছাড়া অলংকার ভালো লাগে না, সেই রকমই সন্তানরহিত গৃহস্থ বাড়ীও খালি-খালি লাগে। রতনজী সব সময় এই চিন্তাতেই ডুবে থাকতেন। উনি মনে-মনে ভাবতেন- "ঈশ্বরের কি আমার উপরে কখনোই দয়া হবে না? আমার কি কখনো কোন সন্তান হবে না?" এই ভেবে উনি প্রায় উদাস থাকতেন। খাবারের প্রতিও কোন রুচি ছিল না। সন্তান প্রাপ্তি কখন হবে, এই চিন্তাতেই দিন কাটত। দাসগণু মহারাজের উপর ওঁর দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। তাই ওঁর সামনে নিজের মনের কথা খুলে বলেন। দাসগণু তখন শ্রী সাইবাবার শরণে যেতে ও তাঁর কাছে সন্তান প্রাপ্তির প্রার্থনা করার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শটি রতনজীর মনেও ধরে এবং উনি শিরডী অভিমুখে রওনা হবেন স্থির করেন। কিছুদিন পর উনি শিরডী আসেন ও বাবার দর্শন করে ওঁর চরণে লুটিয়ে পড়েন। বাবাকে একটা সুন্দর মালা পরান ও অনেক ফুল-ফল অর্পণ করেন। তারপর বাবার কাছে বসে শ্রদ্ধাপূর্বক অনুরোধ করেন- "অনেক বিপদগ্রস্ত লোক আপনার কাছে আসে এবং আপনি তাদের কষ্ট তক্ষুনি দূর করে দেন। এই কীর্তি শুনেই আমিও অনেক আশা নিয়ে আপনার শ্রী চরণে আশ্রয় নিতে এসেছি। দয়া করে আমায় নিরাশ করবেন না।" শ্রী সাইবাবা ওঁর কাছে পাঁচ টাকা দক্ষিণা চান, যেটা উনি নিজেই দিতে চাইছিলেন। কিন্তু বাবা বলেন- "আমি তোমার কাছ থেকে তিন টাকা চৌদ্দ আনা আগেই পেয়ে গেছি, বাকীটাই দাও।" এই কথা শুনে রতনজী একটু অবাক হয়ে যান। বাবার কথার অভিপ্রায় উনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। উনি মনে-মনে ভাবেন- "এটা তো আমার প্রথম শিরডী যাত্রা। তাই এতো খুব আশ্চর্য্যের কথা যে, বাবা তিন টাকা চৌদ্দ আনা আগেই আমার কাছ থেকে কি করে পেলেন?" উনি বাবার এই হেঁয়ালিটি বুঝতে পারলেন না। বাবার শ্রীচরণের কাছেই বসে রইলেন ও বাকি দক্ষিণাটি অর্পণ করেন। এরপর উনি নিজের আগমনের কারণ জানিয়ে পুত্র প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। বাবা করুণায় বিগলিত হলেন। তিনি বললেন- "চিন্তা ছেড়ে দাও, তোমার দুর্দিন এবার শেষ হয়ে গেছে।" উদী দিয়ে বাবা নিজের বরদহস্ত ওঁর মাথার উপর রেখে বললেন- "ভগবান তোমার ইচ্ছে পুরণ করবেন।"

বাবার অনুমতি পেয়ে রতনজী নাঁদেড় ফিরে আসেন ও শিরডীর ঘটনাগুলির

বৃত্তান্ত দাসগণু মহারাজকে বলেন। রতনজী বলেন- "সব কাজই ঠিক মত হলো। বাবার শুভ দর্শন, ওঁর আশীর্বাদ ও প্রসাদও পাওয়া হলো, কিন্তু ওখানকার শুধু একটা কথাই বুঝতে পারলাম না। বাবা বলেন- 'আমি তিন টাকা চৌদ্দ আনা পূর্বেই পেয়ে গেছি।' দয়া করে এর অর্থটা বোঝান। এর আগে আমি শিরডী কখনো যাইনি। তবে যে টাকার কথা উনি উল্লেখ করেছেন, সেই টাকাটা উনি কি করেই বা পেলেন?" দাসগণুর কাছেও এই প্রশ্নটা একটা ধাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ বিষয়ে উনি অনেক দিন চিন্তা করেন। কিছুদিন পর ওঁর মনে পড়ে যে, ক'দিন আগেই রতনজী নিজের বাড়ীতে মৌলা সাহেব নামক এক মুসলমান সন্ন্যাসীকে (সন্ত) আমন্ত্রিত করেছিলেন। (মৌলাসাহেব নাদেড়ের এক প্রসিদ্ধ সন্ত ছিলেন এবং কুলীর কাজ করতেন।) রতনজী মৌলা সাহেবের সম্মান ও সৎকার হেতু একটা ছোট জলপানের আয়োজন করেছিলেন এবং ওঁর আতিথেয়তাতে কিছু টাকা খরচ হয়েছিল। দাসগণু রতনজীর কাছে খরচার সূচীটি চান। এটা জেনে সবার খুব আশ্চর্য্য লাগে যে, ঠিক তিন টাকা চৌদ্দ আনাই খরচ হয়েছিল - এক পয়সা কমও না, এক পয়সা বেশীও না। বাবার ত্রৈকালজ্ঞতার পরিচয় সবাই পেয়ে যায়। যদিও উনি শিরডীতে বাস করতেন, তবুও শিরডীর বাইরে কি-কি হচ্ছে, সেটা তাঁর অজানা থাকে না। যথার্থরূপে বাবা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পূর্ণ জ্ঞাতা এবং প্রত্যেক আত্মা ও হৃদয়ের সাথে তাঁর সম্বন্ধ আছে। তা নাহলে মৌলা সাহেবের অতিথি সৎকারে করা খরচের রাশি বাবা কি করে জানতে পারতেন।

রতনজী এই উত্তর দ্বারা সন্তুষ্ট হন এবং ওঁর মনে শ্রী সাই চরণের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি জাগে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ওঁর ঘরে পুত্ররত্নের জন্ম হয়, যার দরুণ ওঁর আনন্দের সীমা থাকে না। এমন শোনা যায় যে, ওঁর বারোটি সন্তান হয় কিন্তু কেবল চারটি জীবিত থাকে। এই অধ্যায়ের শেষে লেখা আছে যে, বাবা রাওবাহাদূর হরি বিনায়ক শাঠেকে ওঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহর পর পুত্ররত্ন প্রাপ্তির ইঙ্গিত করেছিলেন। রাওবাহাদুর দ্বিতীয় বিবাহ করেন। প্রথমে দুটি মেয়ে হয়, যার দরুণ উনি বেশ নিরাশ হন, কিন্তু তৃতীয় বারে পুত্রের জন্ম হয়। এই ভাবে বাবার কথা সত্য হয় এবং শাঠে সাহেব সন্তুষ্ট হন।

দক্ষিণা মীমাংসা ঃ-

দক্ষিণার সম্বন্ধে কিছু অন্য কথা উল্লেখ করে এই অধ্যায়টি শেষ করব। এ তো সবাই জানে যে যারা বাবার দর্শন করতে আসত, তাদের কাছ থেকে বাবা দক্ষিণা নিতেন। এখানে যে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে যে, বাবা যখন ফকির ও

উদাসীন ব্যক্তি ছিলেন, তখন ওঁর এই ভাবে দক্ষিণা গ্রহণ করা ও কাঞ্চনকে গুরুত্ব দেওয়া কি উচিত ছিল? এবার আমরা এই প্রশ্নের বিষয়ে বিস্তৃত রূপে আলোচনা করব।

অনেকদিন পর্যন্ত বাবা ভক্তদের কাছ থেকে কিছু নিতেন না। তিনি পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি নিজের পকেটে একত্রিত করতেন। ভক্ত হোক বা অন্য কেউ - তিনি কারো কাছ থেকে কিছু নিতেন না। যদি কেউ তাঁর সামনে এক পয়সা রাখত তো তিনি সেটা গ্রহণ করে তা দিয়ে তামাক বা তেল কিনতেন, তিনি প্রায় কলকি পান করতেন। কয়েকজন স্থির করল যে কিছু না দিয়ে সাধুজনের দর্শন করা উচিত নয়। তাই ওরা বাবার সামনে টাকা রাখতে আরম্ভ করল। যদি এক পয়সা রাখা হতো তো তিনি সেটা পকেটে রেখে নিতেন। কিন্তু কেউ যদি দু'পয়সা অর্পণ করত, তাহলে তিনি তক্ষুনি তাকে পয়সা ফেরত দিয়ে দিতেন। শীঘ্রই বাবার নাম ও কীর্তি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে যায় এবং বাবার দর্শনের জন্য ভক্তদের দল শিরডী আসতে শুরু করে। বাবা তখন তাদের দক্ষিণা স্বীকার করতে শুরু করেন। শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, স্বর্ণ মুদ্রার অভাবে ভগবানের পূজোও অপূর্ণ রয়ে যায়। অতএব যখন ঈশ্বর পূজনে মুদ্রার দরকার, তখন সন্ত পূজনেই বা হবে না কেন? শাস্ত্রে বলে যে, নিজের সামর্থ অনুযায়ী ঈশ্বর, রাজা, সন্ত বা গুরুর দর্শন কিছু অর্পণ না করে কখনো করা উচিত নয়। এবার প্রশ্ন ওঠে ওঁদের কি উপহার দেওয়া উচিত? এই সম্বন্ধে উপনিষদে বর্ণিত নিয়মগুলি অবলোকন করা হচ্ছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, একবার দক্ষ প্রজাপতি দেবতা, মানুষ এবং রাক্ষসদের সামনে 'দ' অক্ষর উচ্চারণ করেন। দেবতারা মনে করেন এর অর্থ দম অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করা উচিত। মানুষেরা ভাবল তাদের দান করার অভ্যাস অবলম্বন করতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ও রাক্ষসেরা ভাবে যে, তাদের 'দয়া' অভ্যাস করতে হবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দান ও অন্যান্য সদ্‌গুণের অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। দানের সম্বন্ধে লেখা আছে- "বিশ্বাসের সঙ্গে দান করো।" ভক্তদের কাঞ্চন ত্যাগের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদের আসক্তি দূর করার ও চিত্ত শুদ্ধ করানোর জন্য বাবা সবার কাছ থেকে দক্ষিণা নিতেন। কিন্তু ওঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। বাবা বলতেন- "যা কিছু আমি স্বীকার বা গ্রহণ করি - তার একসো গুণের চেয়েও বেশী আমায় ফেরত দিতে হয়।" তাঁর এই কথার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটা ঘটনা ঃ-

শ্রী গণপতরাও বোডস্, প্রসিদ্ধ শিল্পী, নিজের জীবনীতে লেখেন যে, বাবা বারংবার

অনুরোধ করার ফলস্বরূপ উনি নিজের টাকার থলিটা বাবার সামনে উল্টে দেন। শ্রী বোডস্ লিখেছেন যে, এর পরিণাম এই হয় যে জীবনে কখনো ওঁর আর টাকার অভাব হয়নি এবং প্রচুর মাত্রায় লাভই হয়। দক্ষিণার একটা অন্য অর্থও হতে পারে। দুটো উদাহরণ দিয়ে এই কথাটি স্পষ্ট করা হচ্ছে। বাবা প্রোফেসর সী. কে. নারকের কাছে ১৫ টাকা দক্ষিণা চান। উনি প্রত্যুত্তরে জানান যে, ওঁর কাছে এক পয়সাও নেই। তখন বাবা বলেন- "আমি জানি তোমার কাছে কোন দ্রব্য নেই, কিন্তু তুমি যোগবশিষ্ঠ অধ্যয়ন ত করো, তার থেকেই দক্ষিণা দাও।" এখানে দক্ষিণার অর্থ হলো - বই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে হৃদয়ঙ্গম করা- কারণ হৃদয় তো বাবারই বাসস্থান।

২) দ্বিতীয় ঘটনায় তিনি এক মহিলা শ্রীমতি আর. এ তর্খডের কাছে ছ টাকা দক্ষিণা চান। মহিলা খুবই দুঃখিত হন কারণ ওঁর কাছে দেওয়ার মত টাকা ছিল না। ওঁর স্বামী তখন ওঁকে বোঝান যে, বাবা ছয় মানসিক রিপুর দিকে ইঙ্গিত করছেন যেগুলি বাবাকেই সমর্পণ করে দেওয়া উচিত। বাবাও এই ব্যপারে শ্রী তর্খডের সাথে একমত ছিলেন।

এটা মনে রাখতে হবে যে, বাবার কাছে দক্ষিণা রূপে অনেকটা দ্রব্য একত্রিত হয়ে পড়ত। সব কিছু তিনি সেদিনই খরচ করে দিতেন এবং পরের দিন সকাল থেকে আবার ফকির!

প্রায় ১০ বছর অবধি হাজার-হাজার টাকা দক্ষিণা রূপে পাওয়া সত্ত্বেও, যখন বাবা মহাসমাধি গ্রহণ করলেন তখন তার কাছে অল্প রাশিই অবশিষ্ট ছিল। সংক্ষেপে, দক্ষিণা নেওয়ার প্রধান লক্ষ্য তো কেবল ভক্তদের চিত্ত শুদ্ধি বা ভ্রম দূরীকরণই ছিল।

দক্ষিণার মর্ম ঃ-

ঠানের শ্রী বি. ভি. দেব (সেবা-নিবৃত্ত প্রাপ্ত মাম্লৎদার, যিনি বাবার পরম ভক্ত ছিলেন) এই বিষয় একটা লেখনী প্রকাশিত করেছেন -

"বাবা প্রত্যেকের কাছ থেকে দক্ষিণা নিতেন না। যদি বাবার না চাওয়া সত্ত্বেও কেউ তাঁকে দক্ষিণা দিত তো কখনো গ্রহণ করে নিতেন আবার কখনো অস্বীকারও করে দিতেন। তিনি শুধু নির্দ্দিষ্ট ভক্তদের কাছেই কিছু চাইতেন। এমন লোকেদের কাছে তিনি কখনো দক্ষিণা চাইতেন না, যারা ভাবত বাবা চাইলে তবেই দক্ষিণা দেব। যদি কেউ তাঁকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দক্ষিণা দিত, তাহলে তিনি স্পর্শ করতেন না।

বাবা চাওয়া সত্ত্বেও যারা দক্ষিণা দিত না, তিনি তাদের উপর কখনো রাগ করতেন না। যদি কেউ কোন বন্ধু মারফৎ বাবার জন্য দক্ষিণা পাঠাতো এবং সে সেটা দিতে ভুলে যেতো, তাহলে বাবা তাকে কোন-না-কোন ভাবে মনে করিয়ে দিয়ে সেটি নিয়ে নিতেন। কোন-কোন সময় দক্ষিণার রাশি থেকে কিছু অংশ ফিরিয়ে দিতেন এবং সেটা সামলে বা পূজোর জায়গায় রাখতে বলতেন। ভক্তর তাতে খুব লাভ হতো। যদি কেউ নিজের ইচ্ছের চেয়ে বেশী অর্পণ করতো ত সেই বাড়তি রাশিটা ফিরিয়ে দিতেন। আবার কারোকারো কাছে তিনি তার ইচ্ছের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষিণা চেয়ে বসতেন এবং যদি ওর কাছে সেটা না থাকত, তাহলে অন্যদের কাছ থেকে ধার নিতে বলতেন। কারো-কারো কাছে তো তিনি দিনে তিন চারবার দক্ষিণা চাইতেন।

দক্ষিণার টাকা থেকে বাবা নিজের জন্য খুব অল্প খরচ করতেন - শুধু তামাক ও ধুনির জন্য কাঠ কিনতেন। বাকি সমস্তটাই অন্যান্য লোকেদের বিভিন্ন অংশে বিরতণ করে দিতেন। শিরডী সংস্থানের সমস্ত সামগ্রী অবস্থাপন্ন ভক্তরা রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের প্রেরণায় একত্রিত করেছিল। খুব বেশী মূল্যের সামগ্রী যারা আনত, বাবা তাদের উপর খুব রাগ করতেন এবং বকাবকি করতেন। তিনি নানাসাহেব চাঁদোরকরকে বলেন- "আমার সম্পত্তি কেবল একটি কৌপীন ও একটা গেলাস। লোকেরা মিছিমিছি এত দামী জিনিষ এনে আমায় দুঃখ দেয়।" কামিনী ও কাঞ্চন আধ্যাত্মিক পথের দুটি প্রধান বাধা এবং তার জন্য বাবা দুটি 'পাঠশালা' খুলেছিলেন। দক্ষিণা গ্রহণ করে ও রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ী পাঠিয়ে তিনি এইটাই পরীক্ষা করতেন যে তাঁর ভক্তরা এই দুটি আসক্তি হতে মুক্ত হতে পেরেছে কিনা। তাই যখন কেউ আসত, উনি দক্ষিণা চাইতেন ও 'শিক্ষালয়ে' (রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ী) যেতে বলতেন। ওরা এই দুটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ এটা সিদ্ধ হলে যে কামিনী ও কাঞ্চনের প্রতি তারা উদাসীন, বাবার কৃপায় ও আশীর্বাদে ওদের আধ্যাত্মিক উন্নতি তরান্বিত হত। শ্রী দেব গীতা ও উপনিষদের ঘটনা উদ্ধৃত করে বলেন যে কোন তীর্থস্থানে কোন সন্তকে করা দান, দানীর জন্য খুব কল্যাণকারী হয়। শিরডী ও শিরডীর মুখ্য দেবতা শ্রী সাইবাবার চেয়ে পবিত্র আর কি বা কে হতে পারে?

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।